শিশুদের মানসম্মত শিক্ষার অধিকার

ইমদাদ ইসলাম

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের (SDG's) ৪ মানসম্মত শিক্ষায় সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে সকল ছেলে ও মেয়ে যাতে প্রাসঙ্গিক, কার্যকর ও ফলপ্রসূ অবৈতনিক, সমতাভিত্তিক ও গুণগত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করতে পারে এবং সকল ছেলে ও মেয়ে যাতে প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষাসহ শৈশবের একেবারে গোড়া থেকে মানসম্মত বিকাশ ও পরিচর্যার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে তা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করা হয়েছে। অরক্ষিত জনগোষ্ঠীসহ অসমর্থ (প্রতিবন্ধী) জনগোষ্ঠী, নৃ-জনগোষ্ঠী ও অরক্ষিত পরিস্থিতির মধ্যে বসবাসকারী শিশুদের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সকল পর্যায়ে সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং শিক্ষায় নারী পুরুষ বৈষম্যের অবসান ঘটানোসহ শিশু, অসামর্থ্য (প্রতিবন্ধিতা) ও জেন্ডার বিষয়ে সংবেদনশীল শিক্ষা সুবিধার নির্মাণ ও মানোন্নয়ন এবং সকলের জন্য নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর শিক্ষা পরিবেশ নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।

শিশুদের মানসম্মত শিক্ষার অধিকার একটি মৌলিক মানবাধিকার। এর অর্থ হলো, প্রতিটি শিশুর জন্য উপযুক্ত পরিবেশ, সুযোগ-সুবিধা এবং শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে একটি মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা। এটি শুধু বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া বা বই-খাতা পাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং আনন্দময় ও শিক্ষার্থীবান্ধব পরিবেশে তাদের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশে সহায়তা করাও এর অন্তর্ভুক্ত। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্প্রসারণশীল হলেও শিক্ষার গুণগত মানের ক্রমাগত অবনতির বিষয়ে খোদ শিক্ষাবিদদের মধ্যেই অসন্তোষ রয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ মানসম্মত শিক্ষা। মানসম্মত শিক্ষার মূল উপাদান হলো মানসম্মত শিক্ষক, মানসম্মত শিক্ষা উপকরণ ও মানসম্মত পরিবেশ। আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম, পর্যাপ্তসংখ্যক যোগ্য শিক্ষক, প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষাদান সামগ্রী, ভৌত অবকাঠামো, যথার্থ শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি, কার্যকর ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান এবং গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ ও উপযুক্ত মূল্যায়ন ছাড়া মানসম্মত শিক্ষা অর্জন পুরোপুরি সম্ভব নয়।

আবার মানসম্মত শিক্ষার অধিকারের মধ্যে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সি সকল শিশুর জন্য বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা নিশ্চিত করা। উপযুক্ত পরিবেশ অর্থাৎ শিশুদের জন্য একটি নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর, এবং শিক্ষার্থীবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা, যেখানে তারা আনন্দের সাথে শিখতে পারে। শিশুদের প্রতি সহানুভূতিশীল, যত্নশীল এবং সহায়তাকারী শিক্ষক থাকা, যারা তাদের শেখার আগ্রহ তৈরিতে সহায়তা করবে। সকল শিশুর জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা, লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ণ বা আর্থসামাজিক অবস্থা নির্বিশেষে যেমনটি ইউনিসেফের শিশু অধিকার সনদে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে জীবনব্যাপী শিক্ষার বিষয়টি। বর্তমানে শিক্ষাব্যবস্থায় যে সংকট চলছে তা একদিনের সৃষ্টি নয়, এর মূলে বড় ভূমিকা রেখেছে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ। আমাদের সংবিধানে উল্লেখ আছে, শিক্ষা একটি মৌলিক অধিকার। শিক্ষাকে কখনো পণ্য হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়, এটা আমাদের শিক্ষাদর্শনের ভিত্তি। কিন্তু শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ একে পণ্য হিসেবেই গ্রহণ করেছে। ফলে কোচিং সেন্টার, নোটবই, গাইডবই, কিন্ডারগার্টেন, ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলসহ নানাধরনের শিক্ষা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে ।

শিশুরা একটি জাতির ভবিষ্যৎ। তাদের সঠিকভাবে গড়ে তুলতে হলে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা জরুরি। একটি জাতির সার্বিক উন্নয়ন নির্ভর করে সেই জাতির শিক্ষার মানের ওপর। তাই শিশুদের সুশিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে মাত্র কয়েক দশকের মধ্যে দেশকে উন্নত দেশের কাতারে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। বাংলাদেশসহ অনেক উন্নয়নশীল দেশে মানসম্মত শিশুশিক্ষার নিশ্চিত না করেই শিক্ষার হার বাড়ানোর প্রচেষ্টা থাকলেও এখনো শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। দরিদ্রতা, সামাজিক কুসংস্কার, বৈষম্য এবং পর্যাপ্ত শিক্ষা সুবিধার অভাবে অনেক শিশু শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আমাদের দেশে এখনো অনেক শিশু দারিদ্র্যের কারণে স্কুলে পড়ার সুযোগ পায় না। পরিবারের অসচেতনতা ও আর্থিক সচ্ছলতা না থাকায় তাদের প্রাথমিক শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায় এবং অনেক শিশুকে নিজ আয়ের মাধ্যমে পরিবারের জীবীকা নির্বাহ করতে হয়। গ্রামাঞ্চলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে মানসম্পন্ন পর্যাপ্ত শিক্ষকের অপ্রতুলতা এবং শিক্ষা উপকরণের স্বল্পতা অনেক শিশুকে মানসম্মত শিক্ষা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত করে।

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন এবং প্রতিটি নাগরিকের শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ব্যাপক প্রয়াস চালানো হচ্ছে । তবে কোথাও যেন এই প্রশ্নগুলো থেকেই যাচ্ছে সকলের মনে । শিক্ষাকে সকলের কাছে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করা হলেও অনেক ছেলে মেয়েরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত । প্রাথমিক স্তরে এসব ছেলে মেয়েদের অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা গেলেও মাধ্যমিক স্তর শেষ হওয়ার আগেই এরা লেখাপড়ার ইতি টেনে দেয় । বিশেষত মেয়েশিশুদের ক্ষেত্রে সমাজে এখনও কুসংস্কার এবং প্রথাগত বিশ্বাস রয়েছে। অনেক পরিবার মনে করে মেয়েশিশুদের বেশি পড়াশোনার প্রয়োজন নেই। ফলে মেয়েশিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা শেষে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধকতাসম্পন্ন শিশুরা অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণ স্কুলে পড়তে পারে না, কারণ তাদের জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থা এবং সুযোগ অপ্রতুল। শিশুশিক্ষা নিশ্চিত করার মাধ্যমে একটি উন্নত, সুশৃঙ্খল ও সমৃদ্ধ জাতি গঠন করা সম্ভব। শিশুরা যদি সুশিক্ষিত হয়, তবে তারা শুধু নিজেদের ভবিষ্যতই নয় বরং দেশের ভবিষ্যতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে । তাই শিশুশিক্ষা নিশ্চিত করতে সমাজের সংশ্লিষ্ট সব কর্তৃপক্ষকে দায়িত্বশীলভাবে কাজ করতে হবে।

বর্তমানে শিক্ষাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ল্যাপটপ ও প্রোজেক্টর এর মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাঠদান করা হচ্ছে। শিক্ষক ঘাটতি পূরণের জন্য প্রায় প্রতিবছর বিজ্ঞপ্তির মাধমে মেধাবীদের প্রাথমিক শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। সম্প্রতি প্রইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এর ইনস্ট্রাক্টর ও পিটিআই অভ্যন্তরীণ পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে ঘাটতি কাটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এসব উদ্যোগ নিশ্চয় টেকসই উন্নয়ন এর লক্ষ্য মানসম্মত শিক্ষা অর্জনে সহায়ক হবে। শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুলে একটি নিরাপদ ও কার্যকর শিক্ষা পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য কিছু মৌলিক পরিষেবা ও সুবিধা প্রয়োজন। এর মধ্যে অবকাঠামো,বিদ্যুৎ, স্কুল চলাকালীন ব্যবহারের জন্য সুপেয় পানি, ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক স্যানিটেশন এবং হাত ধোয়ার জন্য সাবান পানি ও চিকিৎসা অন্তর্ভুক্ত। অক্ষম শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপকরন সহ আনুষাংগিক সকল সুবিদা ও পরিষেবা স্কুলে থাকতে হবে। বর্তমানে ৮২ শতাংশ স্কুলে সুপেয় পানির ব্যবস্থা থাকলেও কম সংখ্যক স্কুলে ইন্টারনেট ও কম্পিউটার সুবিধা রয়েছে। স্কুলগুলোতে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা শতভাগ নিশ্চিত করা না গেলেও এ পরিষেবা ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে।

স্বাধীনতার পর থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সরকারের বিশেষ মনোযোগের কেন্দ্র বিন্দুতে রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে এর উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে যার ফলে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এক সময় প্রাথমিক শিক্ষায় মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণ ছিলো খুবই সামান্য, বর্তমানে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। এখন প্রথমিক শিক্ষায় ছেলেদের থেকে মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণ বেশি। অন্যদিকে নীট এনরোলমেন্ট বেড়েছে আশানুরূপভাবে। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সরকার নির্ধারিত বয়সের (৬-১০ বছর) প্রায় শতভাগ শিশু প্রাথমিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায়ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ বেড়েছে । শুধু তাই নয় এ ক্ষেত্রে পাশের হারও বেড়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্র শিক্ষকের অনুপাত ৩৪:১। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সংখ্যাগত দিক থেকে ক্রমাগত অগ্রগতি সাধিত হলেও এর গুণগত মান নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার মতো পরিস্থিতি এখনো তৈরি হয়নি। তাছাড়া পাঁচ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত না করে কম-বেশি ১৩-১৪ শতাংশ শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে। এছাড়াও পাঁচ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা শেষে অনেক শিশুই অংক ও ইংরেজিতে কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয় না। শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। আর প্রাথমিক শিক্ষা হলো শিক্ষার ভিত্তি। ব্যক্তির সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার প্রত্যয় তৈরি হয় শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে। সে কারণে জাতির জন্য একটি সুন্দর ও স্বচ্ছ মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা খুবই দরকার।

#

লেখক: জনসংযোগ কর্মকর্তা, খাদ্য মন্ত্রণালয়।

পিআইডি ফিচার